লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ২১ ● **১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৪** ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

সামাজিক ব্যাংক

বার্তা প্রতিনিধি : চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে স্টেট ব্যাংক্ক অফ ইন্ডিয়া রাজ্যে প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ করেছে। এই অর্থ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও বিদ্যালয়কে।

১৪ জানুয়ারি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রধান কার্যালয়ে কয়েকটি সমাজ কল্যাণ সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারকেও ব্যাংকের সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়।

শেষ পোলিও

বার্তা প্রতিনিধি : পরীক্ষার পালা শেষ হল। এবার ফলের আশায় প্রতীক্ষা করছে গোটা দেশ। ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত নতুন কোনও পোলিও আক্রান্তের সংবাদ নথিভুক্ত না হওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এর কাছ থেকে 'পোলিও মুক্ত দেশ' হিসেবে ভারতের স্বীকৃতি পাওয়ার আশা ক্রমশই উজ্জ্বল হচ্ছে। মার্চে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) ইন্টারন্যাশানাল সার্টিফিকেশন কমিটির বৈঠকে এই শিরোপার ঘোষণা হতে পারে।

ফেসবুক ঘোষণা

বার্তা প্রতিনিধি : প্রাথমিক, ব্লক প্রাথমিক এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে এখন থেকে রোগীকে বিনামূল্যে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ, রক্ত, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা এবং এক্স-রে পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হবে বলে ৪ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুকে ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে বি পি এল মাপকাঠি হবে না। দারিদ্রসীমার উপরে বা নীচে সবাইকে এই সুযোগ দেওয়া হবে। এর ফলে প্রত্যন্ত গ্রামের গরীব মানুষরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

সব প্রাথমিক, ব্লক প্রাথমিক ও গ্রামীণ হাসপাতালে ওষুধের তালিকা টাঙ্গানোও বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

মহিলা গ্রন্থাগার

বার্তা প্রতিনিধি : রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এলাকার মহিলাদের জন্য মহিলা পরিচালিত গ্রন্থাগার চালু হবে বলে জানালেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী আব্দুল করিম চৌধুরী। ২ জানুয়ারি রামপুরহাটে বীরভূম জেলা বইমেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

ব্লক অফিস পরিদর্শন বিদ্যুৎমন্ত্রীর

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যের বিদুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্ত সম্প্রতি বীরভূম যাওয়ার পথে ঘন্টা তিনেক আগে জানিয়ে হঠাৎ আউশগ্রাম-১ ব্লক অফিসে ঢুকে পড়েন। এদিন রবিবার হলেও মন্ত্রীর আসার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি সহ সমস্ত কর্মাধ্যক্ষরা অফিসে ছুটে আসেন। এছাড়াও আসেন বর্ধমান জেলাপরিষদ সদস্যা রুবী ধীবর সহ এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানরাও।

ব্লক অফিসে মন্ত্রী বর্ধমান সদর (উ:) মহকুমা শাসক, বিডিও এবং সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। ব্লক প্রশাসনের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি খোঁজ-খবর নেন। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বিশেষ করে একশ' দিনের কাজের ব্যাপারেও খোঁজ-খবর করেন। ব্লকের যে সমস্ত এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ

এরপর দু'য়ের পাতায়

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ জরুরী

বার্তা প্রতিনিধি : মানুষের জীবন বাঁচাতে প্রকৃতির আর একটি অমূল্য সম্পদ হল জল। জলের সাথে জীবনের সম্পর্ক ওতোপ্রেতভাবে জড়িত। প্রকৃতির সঞ্চিত ভান্ডার থেকে আমরা যে ভাবে জল আহরণ করে চলেছি তাতে ধীরে ধীরে জলের যোগান কমে যেতে পারে। তাই সময় থাকতেই আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই বৃষ্টির জলের কথাই ধরা যেতে পারে। বর্ষাকালই এর উপযুক্ত সময়। রাজ্যে ভাল বর্ষা হলে প্রচুর জলের যোগান থাকে। কিন্তু আমরা সেই জলকে সংরক্ষণ করে ব্যবহারের চেষ্টা করি না। বর্ষার সময় বাড়ীর ছাদ থেকে যে জল পড়ে তা সংগ্রহ করে জমিয়ে রেখে শোধন করা হয়। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ৬ টি স্তর রয়েছে। সেগুলি হল, প্রথমে ছাদ থেকে পাইপের মাধ্যমে বৃষ্টির জলকে নীচে নামিয়ে আনতে হবে। যেখানে জলটা নেমে আসবে

এরপর দু'য়ের পাতায়

উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার ও জনসচেতনতা বাড়াতে

বর্ধমান জেলা পরিষদের রেডিও সেন্টার খোলার উদ্যোগ

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়: জনসাধারণের কাছে জেলাপরিষদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরতে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে নিজস্ব রেডিও সেন্টার খুলতে উদ্যোগী হয়েছে বর্ধমান জেলা পরিষদ। খুব শীঘ্রই এই রেডিও সেন্টার চালু করার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। রেডিও সেন্টারের জন্য জায়গাও চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অনুমোদন পেলেই রেডিও সেন্টার চালু করা হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসাবে শপথ নেওয়ার পর থেকেই দেবু টুডুর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক কাজ জনসাধারণের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতকে কোন একটি গ্রামে জনতার দরবারে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের দাবী দাওয়া, চাহিদার কথা শোনা। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় যা নি:সন্দেহে এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এছাড়াও জেলা পরিষদকে স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলা পরিষদ ভবনের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী বর্ধমানে এসে সরেজমিনে বিষয়টি দেখে গিয়েছেন।। একই রকম ভাবে জেলা পরিষদের উদ্যোগে নিজস্ব রেডিও সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত একেবারে স্বতন্ত্র বলা যেতে পারে।

সভাধিপতি জানান, জেলা পরিষদের কাজকর্মের প্রচার চালাতে এধরনের রেডিও সেন্টার প্রয়োজন। এধরনের রেডিও সেন্টার করতে বেশি খরচ লাগে না।

প্রস্তাবিত রেডিও সেন্টার থেকে ১০ কিলোমিটার রেডিয়াসে প্রচার চালানো যাবে। ১০০ দিনের কাজ, বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, শৌচাগার তৈরি, জল ধরো জল ভরো, নিজভূমি নিজগৃহ, ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রভৃতি প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও প্রচার চালানো হবে। তাছাড়া বর্ধমান জেলা রাজ্যের কৃষি ভান্ডার হিসাবে পরিচিত। সেই কৃষিতে আরও সমৃদ্ধি আনতে চাষী ভাইদের নতুন নতুন চাষবাসের পদ্ধতি এবং আবহাওয়ার গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করা হবে। সবকিছু মিলিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারে খরচ কমাতে রেডিও সেন্টার তৈরিতে বর্ধমান জেলা পরিষদের এই উদ্যোগ সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা যায়।

জীবন জীবিকার মেল বন্ধনে সফল রাজনগর ব্লক মেলা

: রীনা পাল ও দেবালী ঘোষের প্রতিবেদন :

রাজ্য সরকারের সহায়তায় এবং রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সক্রিয় সহযোগিতায় বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের তিনদিন ব্যাপী মানুষ ও মাটির মেলবন্ধনের উৎসব শেষ হল ১৭ই জানুয়ারি। লাল মাটির মানুষের এই উৎসব যা সবার কাছে পরিচিত মাটি, কৃষি, উদ্যানপালন, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মেলা রূপে - তা সম্পূর্ণ হল জীবন জীবিকার মেল বন্ধনের মধ্য দিয়ে। মাটিকে কেন্দ্র করেই যাদের জীবিকার বৃত্ত পূর্ণতা লাভ করে সেই সমস্ত খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষরাই ছিলেন এই মেলার কুশীলব।

১৫ই জানুয়ারি আদিবাসী নৃত্যের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের এই মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু। মেলার অন্যতম অতিথি রাজনগর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সকলের সামনে এই মেলার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হল কৃষি, প্রাণী পালন, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সহ সংশ্লিষ্ট জীবন জীবিকার বিষয়সমূহ বিশেষভাবে তুলে ধরা। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'এলাকায় যে সমস্ত উদ্যোগী চাষী বন্ধু রয়েছেন, যারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত ভাল ভাল অর্থকরী ফসল চাষ করছেন তা সকলের সামনে তুলে ধরা হবে'। এর ফলে অন্যান্য কৃষক বন্ধুরাও তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৃষি অধিকর্তা জয়ন্ত প্রসাদ চন্দ

এরপর ছয়ের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

উন্নততর স্থানীয় সরকার

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন দলের মধ্যে 'ইলেকশান মেনিফেস্টো' তৈরির তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের কিছু কিছু নেটওয়ার্কও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট কিছু দাবীদাওয়াও 'ইলেকশান মেনিফেস্টো'তে ঢোকাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এ কথা ঠিক যে, গরীব মানুষের স্বপক্ষে ওকালতি করে কিছু সুনির্দিষ্ট দাবীদাওয়া তুলে ধরার এটাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল, 'ইলেকশান মেনিফেস্টো'র এই সমস্ত দাবীদাওয়া এবং তার সমাধানের কথা রাজনৈতিক দলগুলি পরবর্তী সময়ে আদৌ মনে রাখবে কি? অনেক নেতিবাচক প্রশ্নের মধ্যেও শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট কিছু দাবীদাওয়া পূরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে চাপ দেওয়ার কৌশল এক্ষেত্রে যথার্থই বলা যেতে পারে।

গ্রাম ও শহরের গরীব মানুষের মূল সমস্যাগুলিকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাদের অধিকাংশ সমস্যাই মূলত: স্থানীয় স্তরে স্বশাসিত সরকারের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। যেমন কাজের সমস্যা, পরিষেবা পাবার সমস্যা, পরিকাঠামোগত সমস্যা সবই কার্যত স্বশাসিত সরকার কেন্দ্রিক। তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি তাদের 'ইলেকশান মেনিফেস্টো'তে স্বশাসিত সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাহলে গ্রাম ও শহরের প্রান্তিক মানুষের বহুবিধ সমস্যার মুস্কিল আসান ঘটাতে কোনওরূপ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, নিজেদের ভাবতে এবং অন্যদের ভাবাতে এতটা সময় নষ্ট হয় যে এতে মূল ভাবনাটাই হারিয়ে যায়। তাই অসংখ্য সেমিনার, কর্মশালায় অযথা সময় নষ্ট না করে প্রান্তিক মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য স্থানীয় স্বশাসিত সরকারকে শক্তিশালী করার দাবীসমূহ রাজনৈতিক দলগুলির 'ইলেকশান মেনিফেস্টো'তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ওকালতি করাটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি জরুরী।

প্রথম পাতার পর

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

সেইখানে জল জমার ব্যবস্থা করতে হবে। জল জমার আধারটি যেন জীবাণুমুক্ত থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ছাদের আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং পাইপের মুখে যাতে কোনওরূপ ময়লা না জমে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। তৃতীয়ত: জলকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ওজোন/ ইউভি লাইট বা অন্য কোন কারিগারি সাহায্য গ্রহণ করতে হবে এবং জল বন্টন করার জন্য একটি উপযুক্ত পাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, বৃষ্টির জল হল ভাল মানের জল, যেখানে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড বা অন্য কোন রাসায়নিক দূষণের সম্ভাবনা থাকে না।

মরুভূমি কবলিত রাজস্থানের বেশ কিছু শহরে বৃষ্টির জল শোধন করে সংরক্ষণ করার ফলে জলের অভাব কিছুটা মেটানোর ক্ষেত্রে ভালই ফল পাওয়া গেছে। এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে এমন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভালো জল পাওয়ার সমস্যা যেমন মিটবে তেমনি বর্ষায় ভালো জলের বিপুল অপচয়ও রোধ করা সম্ভব হবে।

প্রথম পাতার পর

ব্লক অফিস পরিদর্শন

পৌঁছায়নি সেই সব এলাকার বিস্তারিত তালিকা তৈরি করতে তিনি প্রশাসনকে পরামর্শ দেন। কারণ পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত গ্রামে বা বাড়ীতে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেই সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পোঁছে দেওয়ার কর্মসূচি সফল করে তুলতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, শুধু বাড়ী বাড়ী বিদ্যুৎ পৌঁছানোই নয়, চাষের কাজে এবং পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও যে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া প্রয়োজন সেখানেও শীঘ্রই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। বিদ্যুৎমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে পঞ্চায়েতের প্রধানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার কথা মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। তিনি যতদূর করা সম্ভব তা করবেন বলে প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেন। উপস্থিত পদাধিকারীদের প্রতি তার পরামর্শ ছিল, 'নিজ নিজ অফিসগুলি মাসে অন্তত: একবার করে পরিদর্শন করুন। এর ফলে, অফিস পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলি প্রতিকার করা সহজ হবে'।

'দারিদ্ররেখা' - অতীত ও বর্তমান

মাথাপিছু আয়ের একটি নির্ধারিত অঙ্ক আছে, কোনও ব্যক্তির আয় সে অঙ্ক ছুঁতে না পারলে তাকে দরিদ্র হিসাবে গণ্য করা হয়। মাথাপিছু আয়ের এই অঙ্কটি তাই রেখার মতো কাজ করে। রেখার নীচে থাকলেই দরিদ্র, উপরে থাকলে নয়। এই রেখাটি কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, কোথায় স্থাপন করা হবে, বিভিন্ন দেশে তা বিভিন্ন রকম হলেও, দেশে দরিদ্রের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য আগে এরকম একটি রেখা টেনে নেওয়া প্রায় সমস্ত দেশেরই প্রচলিত পদ্ধতি।

দারিদ্ররেখা নির্ধারণের প্রাথমিক কারণ এই রেখার নীচে যারা বসবাস করেন তাদের কাছে বিশেষ কিছু সরকারি সুযোগসুবিধে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু ভারতে এই রেখা নির্ধারণের সূত্রপাত হয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত এক কারণে।

১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব অ-মুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিন্দু প্রজাদের ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। দরিদ্র হিন্দুদের উপর কর চাপানো (৬%) হয়েছিল ধনীদের (২.৫%) চেয়েও বেশী হারে। তবে আধুনিক ভারতে দাদাভাই নওরোজি ১৮৭৬ সালে একটি দারিদ্ররেখা প্রথম নির্ধারণ করেন। ১৮৬৭-৬৮ সালের দামস্তরের ভিত্তিতে যে দারিদ্ররেখাটি তিনি নির্ধারণ করেন সেটি অবশ্য সুনির্দিষ্ট একটি অঙ্ক ছিল না। বরং ছিল আয়ের একটি বিস্তার। মাথাপিছু বার্ষিক ১৬-৩৫ টাকা আয়কে দাদাভাই দারিদ্ররেখা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই যে আয়, সেই আয়টুকু বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যের পিছনে খরচ করার জন্যই প্রয়োজন বলেই দাদাভাই মনে করেছিলেন। এই একই রকম ভাবনা থেকে ১৯৩৮ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিও একটি দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করেছিল, যেটি ছিল মাথাপিছু মাসিক ১৫-২০ টাকা। অত:পর ১৯৪৪ সালে 'বোম্বাই পরিকল্পনা'-র রচয়িতা যে দারিদ্ররেখাটি স্থির করেছিলেন সেটি ছিল মাথাপিছু বার্ষিক ৭৫ টাকা।

স্বাধীনতা - উত্তর ভারতে দারিদ্ররেখা নির্ধারণের প্রথম উদ্যোগটি পি ডি ওঝার। দাদাভাই নওরোজি বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতো পি ডি ওঝাও ভেবেছিলেন ভারতীয় অর্থনীতিতে দারিদ্ররেখা নির্ধারণের জন্য জোর দেওয়া দরকার মূলত: পুষ্টিগত প্রয়োজনের উপর। কারণ জীবনধারণের জন্য তিনটি প্রাথমিক প্রয়োজন----খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মধ্যে বড়জোর খাদ্যের সংস্থানটুকু করে ওঠার সামর্থ্যই একজন দরিদ্র ভারতীয়ের আছে। দাদাভাই নওরোজি তাই একজন গরিব মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম কী কী খাদ্য কতটা প্রয়োজন সেটার একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন এবং সেই তালিকা অনুযায়ী জিনিস কিনতে হলে কত টাকা লাগবে সেটা হিসেব করে দারিদ্ররেখাটি নির্ধারণ করেছিলেন। পি ডি ওঝা সেটা করেননি। এর পরিবর্তে তিনি হিসেব করেছিলেন একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূনতম কত ক্যালোরি খাদ্য লাগতে পারে আর সেই ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য কিনতে ন্যূনতম কত অর্থ প্রয়োজন। পি ডি ওঝা যে হিসেবটি করেছিলেন তাতে একজন মানুষের বেঁচে থাকার ও কর্মক্ষম থাকার জন্য ন্যূনতম ২২৫০ ক্যালোরি পুষ্টি দরকার। ১৯৬০-৬১ সালের দাম স্তর অনুযায়ী, পি ডি ওঝার হিসেব মাফিক, গ্রামাঞ্চলে এই পরিমাণ পুষ্টি অর্জনের জন্য ৮-১১ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১০-১৮ টাকা লাগার কথা।

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬২ সালে প্রথম সরকারি স্তরে দারিদ্ররেখা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এর জন্য কমিশন নিয়োজিত স্টাডি গ্রুপ ১৯৬০-৬১ সালের দামস্তর অনুযায়ী মাথাপিছু মাসিক ২০ টাকা ভোগব্যয়কে দারিদ্ররেখা হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে এই হিসেব তা স্টাডি গ্রুপ জানায়নি। ফলে এই হিসেব মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল। তবে স্টাডি গ্রুপ না জানালেও এই সময় বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নিজেদের উদ্যোগে দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করতে শুরু করেছিলেন। এদের প্রত্যেকেই দারিদ্রের ক্যালোরি ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতিটিই অনুসরণ করেছিলেন। অধ্যাপক দান্ডেকর এবং নীলকন্ঠ রথ যেমন ধরে নিয়েছিলেন একজন মানুষের কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে থাকার জন্য দৈনিক ২২৫০ ক্যালোরি পুষ্টির প্রয়োজন। ক্যালোরির এই হিসেব ধরলে ১৯৬০- ৬১ সালের দামস্তর অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে একজন মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মাসিক ১৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে মাসিক ২২.৫০ টাকা। এঁরা দু'জন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ই পি ডব্লিউ দা কোস্তা, বি এস মিনহাম,প্রনব কুমার বর্ধন বা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করেছেন। এঁরা সবাই মোটামুটি একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তবে দারিদ্ররেখাটি সবার জন্য একই রকম ছিল না।

১৯৭৭ সালে পরিকল্পনা কমিশন দারিদ্ররেখাটির পুনর্মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে অর্থনীতিবিদ ওয়াই কে অলঘের নেতৃত্বে একটি 'টাস্ক ফোর্স অন প্রোজেকশনস অফ মিনিমাম নিডস অ্যান্ড এফেক্টিভ কনজাম্পসন ডিমান্ড' গঠন করেন। টাস্ক ফোর্স দেশের তৎকালীন জনসংখ্যার বয়সগত, লিঙ্গগত, জীবিকাগত কাঠামো বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকার মানুষের কার কতটা পুষ্টির দরকার সে ব্যাপারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের সুপারিশকে বিবেচনায় রেখে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু ২৪০০ ক্যালোরি ও শহরাঞ্চলে মাথাপিছু ২১০০ ক্যালোরির পুষ্টিকে একজন ব্যক্তির দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবে সুপারিশ করেন। এই পরিমাণ পুষ্টিশক্তি অর্জনের জন্য ১৯৭৯-৮০ সালের দামস্তর অনুযায়ী গ্রামীণ ক্ষেত্রের জন্য দারিদ্ররেখাটি মাথাপিছু মাসিক ৭৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলের জন্য মাথাপিছু মাসিক ৮৮ টাকা ধার্য করা হয়। এই মাপকাঠিকে বিভিন্ন বছরের দারিদ্ররেখা নির্ধারণের জন্য দামস্ফীতি সূচকের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পালটে নিতে হবে বলে বলা হয়। ১৯৭৮ সালে সপ্তম অর্থ কমিশন দারিদ্রের আরও সর্বাত্মক একটি পরিমাপের উদ্দেশ্যে নতুন একটি দারিদ্ররেখার প্রবর্তন করে। অর্থ কমিশনের যুক্তি ছিল 'দারিদ্র পরিমাপের সময় দেখা হয় কোন কোন মানুষের ব্যয়ের পরিমাণ দারিদ্ররেখার নীচে। কিন্তু এই ব্যয় তো তার ব্যক্তিগত খরচ। সরকার গণভোগ্য দ্রব্যের পিছনে যে খরচ করে তার একটা গড় হিসেবও এই সঙ্গে ধরা উচিত। তাহলেই কোনও ব্যক্তির মোট খরচের একটা ধারণা পাওয়া যাবে। আর সেটা করতে গেলে, একই যুক্তিতে, দারিদ্ররেখাটিরও একটি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন দরকার। এই যুক্তিতে সপ্তম অর্থ কমিশন যে দারিদ্ররেখাটি প্রস্তাব করে তার নাম দেয় 'পরিবর্তিত দারিদ্ররেখা'। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের তরফেও ভারতের দারিদ্র হার পরিমাপের উদ্দেশ্যে একটি দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বব্যাংক যে দেশভিত্তিক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৯৮৯ সালে সেখানে পালা পড়েছিল ভারতের। সমীক্ষা রিপোর্টের নাম ছিল 'ইন্ডিয়া : পভার্টি, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস'। মোটামুটি পরিকল্পনা কমিশনের ক্যালোরি ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করলেও এই প্রতিবেদনে গরিবের পক্ষেও অপরিহার্য কিছু দ্রব্যাদিকে তালিকাভুক্ত করে দারিদ্ররেখাটি নির্ধারণ করা হয়। এইভাবে যে রেখাটি বিশ্বব্যাংক নির্ধারণ করেছিল, সেটি ১৯৮৩ সালের দামস্তর অনুযায়ী ছিল গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু ৮৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১১২ টাকা।

পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ডি কে লাকড়াওয়ালার নেতৃত্বে এই দলের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল দারিদ্ররেখাটি পুনর্নির্ধারণের। এই দল দারিদ্রের ক্যালোরি ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতিকে মেনে নিলেও নিয়মিত দারিদ্র হার হিসেবের জন্য দামস্ফীতি হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্ররেখাটির পরিমার্জনের যে পদ্ধতি, তাতে পরিবর্তন আনতে বলে। একটি জাতীয় দামসূচকের সাহায্যে সামঞ্জস্য বিধানের পরিবর্তে গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দারিদ্ররেখাটি কৃষিমজুরদের জন্য প্রযোজ্য দামসূচকের সাহায্যে এবং শহর এলাকার ক্ষেত্রে শিল্পশ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য দামসূচকের সাহায্যে দারিদ্ররেখাটির সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হয়। এছাড়া জাতীয় দারিদ্ররেখা নির্ধারণের পরিবর্তে রাজ্যওয়াড়ি দারিদ্ররেখা নির্ধারণের দিকে জোর দেওয়া হয়।

২০০৫ সালে পুনরায় একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে

এরপর পাঁচের পাতায়

খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে জানুন

বর্তমানে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তার অন্যতম হল ভেজাল। খাদ্য থেকে শুরু করে প্রসাধন, ওষুধ, রঙ, সবজি সব কিছুতেই ভেজালের রমরমা। ভেজালের ইতিহাস যেমন পুরোনো তেমনি ধনী-দরিদ্র, প্রথম বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্ব সর্বত্রই ভেজালের অস্থিত্ব বিরাজমান। তবে আমাদের মতো অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ যেখানে জনসচেতনতা এখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি, সেখানে ভেজালের দৌরাত্মে অভেজালটা খুঁজে পাওয়া দুরূহ। তবে সব কিছুর মধ্যে খাদ্যে এবং ওষুধে ভেজাল মারাত্মক এবং সুদূরপ্রসারী, তাই কমবেশি সব দেশে খাদ্যে ভেজাল রোধের জন্য আইন আছে। আমাদের দেশেও আছে। আমাদের দেশে প্রথম ১৯৫৪ সালে 'খাদ্যে ভেজাল নিরোধক আইন' (The prevention of Food Adulteration Act, 1954) তৈরি হয়। আইনানুযায়ী (PFA Act, 1954) ভেজাল বলতে বোঝায় যদি -

১) খাদ্য বস্তুটি যে গুণমানের বা বৈশিষ্ট্যের বলে বিক্রি করা হচ্ছে, যদি সেই গুণমানের বা উপাদানের বা বৈশিষ্ট্যের না হয়।

২) খাদ্য বস্তুটির কোন উপাদান যদি নিজস্ব গুণমানের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

৩) খাদ্য বস্তুটিকে যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন পাত্রে রাখা থাকে।

৪) খাদ্য বস্তুটিতে যদি নিজস্ব উপাদানের বদলে নিম্নমানের বা সস্তার উপাদান মেশানো হয়।

৫) খাদ্য বস্তুটিতে যদি বিষাক্ত কোন উপাদান থাকে।

৬) আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে কোন নোংরা, পচা রোগমুক্ত প্রাণীজ বা উদ্ভিদ উপাদান থাকে, যার ফলে খাদ্য বস্তুটির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

৭) খাদ্য বস্তুটিতে যদি অননুমোদিত রঙ বা বেশি মাত্রায় কৃত্রিম রঙ বা সংরক্ষক মেশানো থাকে।

৮) খাদ্য বস্তুটির পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা যদি নির্দিষ্ট মানের নীচে থাকে বা অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের এই আইনটি বাতিল করে নতুন আইন ঘোষিত হয় ২০০৬ সালে। কিন্তু কোলকাতা পুরসভায় এই আইনটি কার্যকর হয়েছে আইন প্রণয়নের ৫ বছর বাদে ২০১২ সালে।

খাবারে রঙ

সাধারণভাবে বাড়িতে তৈরি খাবারে যে রঙ ব্যবহার করা হয় সেগুলো প্রাকৃতিক রঙ। মশলাপাতি দিয়ে এই রঙ আনা হয়। যেমন হলুদ দিয়ে হলদে রঙ, লংকা দিয়ে লাল রঙ। মশলা বিশুদ্ধ হলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বাড়িতে কৃত্রিম দেওয়ার চলটা কম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম রঙের পরোক্ষ ব্যবহার আছে। পরোক্ষ ব্যবহার মানে, বাজার থেকে কিনে আনা রান্না করা খাবার তো আমরা কমবেশি সবাই ব্যবহার করি। সেগুলোতে কৃত্রিম রঙ থাকতেই পারে। কিংবা কাঁচা শাক-সবজি বা মশলাপাতিতেও কৃত্রিম রঙের ব্যবহার আছে। সেগুলোর জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

খাবারের জন্য সরকার কতগুলো রঙকে স্বীকৃতি দিয়েছে। খাবারের রঙ নিয়ে এখানে পরিস্কার নির্দেশিকা দেওয়া আছে। সেই নির্দেশিকা অনুসারে কতটা কি কাজ হচ্ছে, আইন কতটা রক্ষিত হচ্ছে, তা দেখভালের দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন সবাই মিলেই এই ব্যাপারটি দেখাশোনা করে। এজন্য নানা সাব কমিটি আছে। সেই কমিটি বিশেষজ্ঞদের এনে রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে খাবারে কোনটা ব্যবহার করা ঠিক, আর কোনটা নয়। কতটা পরিমাণে ব্যবহার করা ঠিক, কতটা নয় তাও আইনে বলা আছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৮টি রঙকে খাবারে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল লাল রঙ আনতে পনকিউ ফোর, কারমোসিন, এরিথ্রোসিন প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। হলুদের জন্য স্বীকৃত রঙ হল টারট্রাজিন, সানসেট ইয়েলো। নীলের জন্য ইনডিগো কারমাইন, ব্রিলিয়ান্ট ব্লু এফ সি এফ এবং সবুজের জন্য ফার্স্ট গ্রীণ এফ.সি.এফ (First Green FCF) ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে শুধু স্বীকৃত রঙ ব্যবহার করলেই হবে না। কোন খাবারে কোন রঙ সর্বোচ্চ কতটা পরিমাণ করা যেতে পারে, তাও আইনে পরিস্কার বলা আছে। যেমন ধরুন আইসক্রীম, বিস্কুট, পেস্ট্রি, কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদিতে রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে প্রতি কেজিতে সর্বোচ্চ ১০০ মিলিগ্রাম। ফ্রুট সিরাপ, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলির মতো খাবারে প্রতি কেজিতে ২০০ মিলিগ্রাম রঙ দেওয়া যেতে পারে। এই পরিমাণ ছাড়ালে কিন্তু বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, এত সব নিয়ম জানা তো একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, তাহলে কি হবে? উত্তর হল, আইনটা পুরোপুরি জানা না থাকলেও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন কিন্তু হতেই হবে। তাহলে অন্তত: একেবারে না জেনে বুঝে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কমবে। এলাকার কোনও বিশেষ দোকানদার হয়তো বছরের পর বছর খাবারে আপত্তিকর রঙ মিশিয়ে দিব্যি ব্যবসা করছেন, বিন্দুমাত্র সচেতন না হলে কিন্তু উনি দিনের পর দিন পার পেয়ে যাবেন আর এলাকার মানুষ কোনও বিশেষ রোগে ভুগতে থাকবেন।

সরকার যে রঙগুলোকে স্বীকৃতি দেয়নি, তার বাইরের রঙ খাবারে ব্যবহার করা আইন বিরুদ্ধ শুধু নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারকও বটে। বাজার থেকে যখন খাবার কিনছেন, প্যাকিংটা ভালো করে লক্ষ্য রাখুন। এখানে রঙ সম্পর্কেও

উল্লেখ করা হয় (অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে নয়)। খাবারে কি কি উপকরণ দেওয়া আছে, তার প্রত্যেকটি ওই লেবেলের ওপর দেওয়াটা নিয়মের মধ্যে পড়ে। লেবেল ছাড়া খাদ্য বস্তু বাজারে আনা যেমন বেআইনি, তেমনি এটি বিক্রি করলে দোকানদারও আইনের চোখে দোষী।

মিষ্টির দোকান বা হোটেল-রেস্তোরাঁয় কিনতে গিয়ে বা খেতে গিয়েও যদি রঙের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক কিছু মনে হয়, দোকানি বা খাবার পরিবেশকের কাছে তাদের খাবারে কি কি ধরনের রঙ ব্যবহার করা হয় বা হয়েছে, তার প্যাকেট দেখতে চাওয়াটা কিন্তু আপনার অধিকারের মধ্যেই পড়ে। 'ক্রেতাসুরক্ষা আইন ১৯৮৪' তে এ নিয়ে ক্রেতার অধিকারের কথা বলা আছে।

খাবারে 'অ্যাডিটিভ'

প্রথমে বলি, 'অ্যাডিটিভ' ব্যাপারটা কি? 'অ্যাডিটিভ' হল তেমনই একটা জিনিস, যা খাবারে ব্যবহার করে তার মান বাড়ানো হয়। শুরুতে যে আইনের কথা বলেছিলাম, সেই আইনে সরকার স্বীকৃত 'অ্যাডিটিভ' নিয়েও একটা তালিকা আছে। সেই তালিকার বাইরে কোনও কিছু খাবারে যোগ করা আইনত অপরাধ। মুড়ি ও চা- তে 'অ্যাডিটিভ' থাকে। এবার মুড়ির কথা বলি। মুড়ি ধবধবে সাদা এবং আকারে বড় করার জন্য অনেক সময়ই অসাধু ব্যবসায়ীরা ইউরিয়া মেশান। এমনিতে ইউরিয়া প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া শরীরে গেলে নানা অসুবিধে তৈরি হতে পারে। সন্তান উৎপাদনে বাধা আসতে পারে। কিডনির সমস্যা হতে পারে। এমনকি ক্যানসারও হতে পারে। মুড়িতে ইউরিয়া মেশানো আছে কিনা একটু কষ্ট করলেই জানতে পারা সম্ভব। ১০ গ্রাম মতো মুড়ি নিয়ে তাতে ৫০ মিলি (মানে মোটামুটি আধ কাপ) জল দিয়ে নাড়তে থাকুন। ৫ মিনিট বাদে সেই জল ছেঁকে একটা পাত্রে নিয়ে এক চামচ গুঁড়ো অড়হর ডাল বা সয়াবিনের বীজের গুঁড়ো দিন। তারও ৫ মিনিট বাদে লাল লিটমাস কাগজ (যে কোনও কেমিক্যালস-এর দোকান, স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরীতে এটি পাবেন) মিশ্রণটি দিন। যদি লিটমাস কাগজটির রঙ নীল হয়ে যায়, তখন মুড়িতে ইউরিয়া আছে ধরা যেতে পারে। আসলে অড়হর ডাল বা সয়াবিন হল ইউরিয়েজ নামের একটি এনজাইমের উৎস। ইউরিয়েজ এনজাইম, ইউরিয়াকে ভেঙে অ্যামোনিয়া তৈরি করে, যার জন্য রঙের এই পরিবর্তন হয়। এবারে চায়ের কথা বলি। একটা ভেজা সাদা কাগজের ওপর বাজার থেকে কিনে আনা চা পাতা ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাগজের ওপর গোলাপী বা লাল রঙের ছোপ ফুটে উঠলে বুঝবেন চায়ে ভেজাল আছে। চায়ে অনেক সময় কোলটার ডাই-ও মেশান অসাধু ব্যবসায়ীরা। এটিও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এটাও সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটু রেকটিফায়েড স্পিরিট (সাধারণভাবে যে স্পিরিট নানা কাজে আমরা ব্যবহার করি) কাপে নিন। তাতে বাজারের থেকে কিনে আনা চা পাতা দিন। কিছুক্ষণ বাদে স্পিরিট থেকে চা পাতাটা ছেঁকে নিয়ে শুধুমাত্র স্পিরিটের দ্রবণটায় এক-দু ফোঁটা মিউরেটিক অ্যাসিড যোগ করুন। যদি রঙের পরিবর্তন হয় (বিশেষ করে লাল হয়ে যায়), বুঝবেন চা পাতাটি গোলমেলে।

এমনিতে একটা ব্যাপার বলে রাখি, ঠান্ডা জলে চা পাতা দিলে কিন্তু কোনও রঙ বেরনোর কথা নয়। যদি চা পাতায় অন্য কিছু মেশানো থাকে, তবেই এ অবস্থায় রঙ বেরয়। এটাও কিন্তু চা পাতা ভালো কি মন্দ বোঝার সহজ একটি উপায়।

খাবারে আজিনামোটোর

আজিনামোটোর একটা রাসায়নিক পদার্থ যার বৈজ্ঞানিক নাম মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। এর নিজের কোনও গন্ধ নেই - কিন্তু এটি হল গন্ধ-বর্ধক বা ফ্লেভার এনহ্যান্সার। এটি নিয়মিত বেশি পরিমাণে খেলে পরিপাকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। আজিনামোটোরের কারণে 'চাইনিজ রেস্তোরাঁ সিনড্রোম' বলে একটি রোগ হয়। প্রথম প্রথম যার ফলে একটু গা-হাত-পা-ঘাড়ে ব্যথা হয়। পরের দিকে চামড়া ঝুলে যায়। অল্প বয়সেই বৃদ্ধদের মতো দেখতে লাগে।

যে শিশুর বয়স ১২ মাসের নীচে, তাদের খাবারে আজিনামোটোর দেওয়া একেবারেই ঠিক নয়। সন্তানসম্ভবা মহিলাদেরও আজিনামোটোর এড়িয়ে চলা উচিত। আজিনামোটোর মস্তিষ্কের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। ফলে বুদ্ধির বিকাশ আটকে যায়। আজিনামোটোর ভ্রূণের বিকাশের ওপর আঘাত আনতে পারে। আজিনামোটোর তো বটেই, বাজারে চালু নুডলস মশলাও সবারই এড়িয়ে চলা উচিত। তবে আজিনামোটোর কার্সিনোজেসিক, অর্থাৎ এটি খেলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন কথা কিন্তু এখনও অবধি প্রমাণিত নয়।

ভেজাল খাদ্যের রমরমা ব্যবসা বন্ধে আমাদের কি করা উচিত?

১) ভেজাল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকার তথা স্থানীয় উচ্চতর প্রশাসনকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে।

২) প্রতিটি ব্লক ও পৌর এলাকায় খাবারের নমুনা দোকান থেকে সংগ্রহ করে উন্নত মানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতে হবে এবং দ্রুত রিপোর্ট প্রকাশ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) ভেজাল সংক্রান্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এজন্য আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করা দরকার।

৪) ভেজাল আক্রান্ত বা অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পেশাগত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

৫) খাদ্য পরিদর্শকের সংখ্যা ও কার্যক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্য ক্রেতাসুরক্ষা বিভাগকে আরো সক্রিয় হতে হবে।

৬) ওষুধের দোকানে যাতে বাতিল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি না হয় সেই ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে।

৭) কৃত্রিম রঙীন খাবার পুরোপুরি বর্জন করতে হবে, পরিবর্তে প্রাকৃতিক রঙীন খাবার খেতে হবে।

৮) দোকানদারদের কৃত্রিমরঙের ক্ষতিকারক দিকগুলি বোঝাতে হবে।

৯) ওষুধ শিল্পে রঙের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে।

১০) ভেজাল ধরার হাতে কলমে পরীক্ষাগুলি প্রচার করা দরকার।

১১) খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ব্লকে, পৌরসভায় খাদ্য পরিদর্শক পদে লোক নিয়োগ করতে হবে।

আরও খবর চারের পাতায়

খাদ্যে ভেজাল হাতে কলমে কিভাবে ধরবেন

১। খাদ্য:
মিহিদানা, বোঁদে, লাড্ডু, জিলিপি, বেবি ফুড, ডাল ইত্যাদি।
ভেজাল রঙ:
কিশোরী রঙ (মেটানিল ইয়েলো)
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন:
হলুদ রঙের জন্য খাবারটিকে একটি পাত্রে নিয়ে কয়েক ফোটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCL) মেশালে মিশ্রণ গোলাপী বর্ণ হলে বুঝতে হবে খাদ্যে কিশোরী রঙ আছে।
কি কি ক্ষতি হয়
স্তনের টিউমার, কিডনি ও ফুসফুসের রোগ, শুক্রাণু উৎপাদনে ব্যাঘাত। মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে

যাওয়া ইত্যাদি।
২। খাদ্য:
লাল মিষ্টি ও সবুজ মিষ্টি।
ভেজাল রঙ:
রেড অক্সাইড এবং ম্যালাসাইড গ্রীণ।
কি কি ক্ষতি হয়?
মাথা ঘোরা, বমিভাব, দুর্বলতা ও ক্যানসারের আশংকা।
৩। খাদ্য:
শুকনো লঙ্কা, রাঙা আলু, জেলি, সস, জ্যাম, লজেন্স, চকোলেট, সিরাপ, মাছের কানকো ইত্যাদি।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
১) তরল প্যারাফিনে তুলো ভিজিয়ে রঙীন খাবারের গায়ে ঘষতে থাকলে তুলো লাল হলে বুঝতে হবে রঙটি কঙ্গো রেড।
২) রোডাবিন-বি মেশানো রঙীন খাবারে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড যোগ করলে রঙ অদৃশ্য হবে। পরে আবার লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCL) যোগ করলে লাল রঙ ফিরে আসবে।
কি কি ক্ষতি হয়?
মুত্রাশয়, মস্তিস্কে, চোখে ও প্লীহাতে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং টিউমারও হতে পারে। ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। স্নায়ু রোগ বৃদ্ধি পায়।
৪। খাদ্য:
গুঁড়ো লংকা।
ভেজাল রঙ:
লেড ক্রোমেট
কি কি হতে পারে?
রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে।
৫। খাদ্য:
সবুজ সব্জি, জেলি, সস, জ্যাম, চকোলেট, মটরশুটি লজেন্স।
ভেজাল রঙ:
সবুজ রঙের জন্য ম্যালাকাইট গ্রীণ ও তুঁতে ব্যবহার করা হয়।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
তরল প্যারাফিনে ভেজা সাদা তুলো দিয়ে ঘষতে থাকুন, তুলো সবুজ হলে বুঝতে হবে খাদ্যে ভেজাল হিসেবে ম্যালাকাইট গ্রীণ আছে।
কি কি ক্ষতি হয়?
শুক্রাশয়, মূত্রাশয়, প্লীহা, কিডনি, যকৃৎ ও স্তনের রোগ হয়। গ্যাস্ট্রাইটিস হয়।
৬। খাদ্য:
দুধ।
ভেজাল রঙ:
জল, অ্যারারুট, আটা, ভাতের মাড় , ময়দা, চিনি, বাতাসা, ইউরিয়া, সোডা প্রভৃতি।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
১) ল্যাকটোমিটার পাঠ ২৬ ডিগ্রির কম হলে বুঝতে হবে দুধে জল মেশানো হয়েছে। পাঠ ঠিক রাখতে ভাতের মাড়, অ্যারারুট, ময়দা সহ বিভিন্ন স্টার্চ মেশানো হয়। টিংচার আয়োডিন বা আয়োডিন দ্রবণ মেশালে দ্রবণ নীলবর্ণ হবে (স্টার্চ আয়োডাইট তৈরি হয়, এর বর্ণ নীল)।
২) ১০ মিলি দুধে ১ চামচ ঘন অ্যাসিড ও ১ চামচ চিনি মিশিয়ে রাখলে দ্রবণ লালবর্ণ হবে। বুঝতে হবে দুধে বনস্পতি বা ডালডা আছে।
৩) ২০ মিলি দুধে সামান্য রোসালিক অ্যাসিড দিলে দ্রবণ (দুধ) গোলাপী বর্ণ হবে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে দুধে সোডা জাতীয় ক্ষারীয় পদার্থ রয়েছে।
৪) ১০ মিলি দুধে ১ চামচ অড়হর ডালের গুঁড়ো বা সোয়াবিনের গুঁড়ো মিশিয়ে ৫ মিনিট রাখলে লাল লিটমাস - এর রঙ নীল বর্ণ হবে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে দুধে ইউরিয়া আছে।
৫) ৫ মিলি দুধে ২ মিলি ঘন (HCL) অ্যাসিড সহ ৫০ মিগ্রা রিসরসিনল মিশিয়ে গরম করলে দ্রবণটির বর্ণ লাল হবে। এক্ষেত্রে দুধে চিনি বা বাতাস আছে।
কি কি ক্ষতি হয়?
দুধে ভেজালের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক হল আর্থিক ক্ষতি।
৭। খাদ্য:
ঘি, মাখন।
ভেজাল রঙ:
ডালডা (বনস্পতি), আলু সিদ্ধ।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?

টেস্ট টিউবে ১ চামচ ঘি বা মাখন নিতে হবে। ১ চামচ ঘন (HCL) অ্যাসিড ও সামান্য চিনি নিয়ে মিশ্রণটিকে সামান্য গরম করে ঝাঁকাতে হবে। পরে দ্রবণের নীচের স্তর গাড় খয়েরী রঙ ধারণ করলে ঘি বা মাখনে ডালডা বা বনস্পতি মেশানো আছে। ঘি গলিয়ে তার মধ্যে সামান্য টিংচার আয়োডিন বা আয়োডিন দ্রবণ যোগ করলে নীলবর্ণ হলে বুঝতে হবে ঘিতে আলু সিদ্ধ মেশানো হয়েছে।
কি কি ক্ষতি হয়?
বেশি পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়। রক্তে কোলেস্টেরল বাড়বে, হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়বে।
৮। খাদ্য:
মুড়ি।
ভেজাল রঙ:
ইউরিয়া: মুড়িকে বেশি সাদা ও ফোলা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
অল্প পরিমাণে মুড়ি অল্প জলে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ছেঁকে জল সংগ্রহ করে তাতে ২ চামচ অড়হর ডালের গুঁড়ো মিশিয়ে সামান্য গরম করে ৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। দ্রবণে ফিনপ্থ্যালিন মেশালে গোলাপী বর্ণ হবে। বুঝতে হবে মুড়িতে ইউরিয়া আছে।
কি কি ক্ষতি হয়?
কিডনির রোগ, ক্যানসার, সন্তান উৎপাদন বাধা সৃষ্টি ইত্যাদি।
৯। খাদ্য:
সর্ষের তেল (ভোজ্য তেল)।
ভেজাল রঙ:
শিয়াল কাঁটা বীজের তেল রেড়ির তেল, ধুতুরা।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
১) তেল এবং ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ১:১ অনুপাতে ঝাঁকাতে হবে, অ্যাসিড স্তর লাল হলে বুঝতে হবে শিয়াল কাঁটার তেল আছে।
কি কি ক্ষতি হয়?
হৃদরোগ বেড়ে যায়। শিয়ালকাটার বীজের তেলের জন্য লিভার, কিডনি ও মস্তিস্কের ক্ষতি হয়।
১০। খাদ্য:
চা।
ভেজাল রঙ:
লৌহচূর্ণ, চামড়ার গুঁড়ো, ডালের ভুষি, রঙ করা পূর্বে ব্যবহৃত চা পাতা।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
১) একটি ভিজে ব্লটিং কাগজে ছড়িয়ে দিলে যদি কাগজে লালচে দাগ পড়ে তবে বুঝতে হবে পূর্বে ব্যবহৃত রঙ করা চা পাতা রয়েছে।
২) চায়ে গরম জল মিশ্রণ তৈরি করে তাতে লঘু (HCL) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ($KMnO_4$) ঢালতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দ্রবণ বর্ণহীন হচ্ছে। এরপর কষ্টিক সোডা (NaOH)যোগ করা হয়। পরে তুঁতের লঘুদ্রবণ ($CuSO_4$) যোগ করলে যদি দ্রবণটি লাল বা বেগুনী হয়, তবে বুঝতে হবে চা পাতায় চামড়ার গুড়ো মেশানো আছে।
কি কি ক্ষতি হতে পারে?
মোটর নার্ভ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মানুষ পঙ্গু হয়ে যায় এলার্জী ও হাত পা ফুলে যাওয়া। হজমের গন্ডগোল আছে।
১১। খাদ্য:
কফি।
ভেজাল রঙ:
তেঁতুল বীজের গুঁড়ো, পোড়া পাউরুটির গুঁড়ো।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
১) এক গ্লাস জলে সামান্য কফি দিলে জলে ভাসবে। কিন্তু তেঁতুল বীজের গুঁড়ো ডুবে যাবে। পোড়া পাউরুটির গুঁড়ো ধরার জন্য গরম জলে সামান্য কফি দিয়ে তরল মিশ্রণ তৈরি করে লঘু (HCL) অ্যাসিড ও পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ($KMnO_4$) এর মিশ্রণ ঢালতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বর্ণহীন হয়। এরপর ১% আয়োডিন দ্রবণ ২/১ ফোটা দিলে যদি নীলবর্ণ ধারণ করে তাহলে বুঝতে হবে কফিতে পোড়া পাউরুটির গুঁড়ো রয়েছে।
২) কফিতে তেঁতুল বীজের গুঁড়ো আছে কিনা বোঝার জন্য ১ গ্লাস জলে ১ চামচ কফি দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যদি দেখা যায় কফি গুঁড়ো থিতিয়ে গ্লাসের তলায় জমা হচ্ছে তবে তা কফির বদলে তেঁতুল বীজের গুঁড়ো।
কি কি ক্ষতি হয়?
আর্থিক ও দৈহিক ক্ষতি হয়।
১২। খাদ্য:
গোলমরিচ।
ভেজাল রঙ:
পেঁপে বীজ।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
কুঁচকে যায়, সবুজ ভাব থাকে যা ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।
কি কি ক্ষতি হয়?
আর্থিক ক্ষতি।
১৩। খাদ্য:
বেসন।
ভেজাল রঙ:
খেসারীর ডাল।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
লঘু (HCL) অ্যাসিডের মধ্যে (৫০ মিলি), ১০ গ্রাম বেসন যোগ করলে ১৫ মিনিট পরে

গোলাপী বর্ণ ধারণ করবে, বুঝতে হবে ভেজাল রয়েছে।
কি কি ক্ষতি হয়?
পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।
১৪। খাদ্য:
আটা, ময়দা, সুজি।
ভেজাল রঙ:
কালি, মাটি, আবর্জনা, পোকা।
ভেজাল কিভাবে হাতে কলমে ধরবেন?
ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।
কি কি ক্ষতি হয়?
আর্থিক ক্ষতি।

✸ এই সমস্ত জিনিসের মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার সব ক্ষেত্রেই ক্যানসারের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে।

মহিলাদের আইনি অধিকার

ইন্ডিয়ান পিনাল কোড, ১৮৬০ অধীন মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা

ধারা আইপিসি	অপরাধ	শাস্তি	জামিনযোগ্য/ অজামিনযোগ্য
২২৮-এ	কতিপয় অপরাধের আক্রান্তের প্রকাশ।	দু-বছরের জন্য হাজতবাস ও ফাইন	শাস্তিযোগ্য এবং জামিনযোগ্য।
২৯৪	অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও গান।	তিন বছরের জন্য হাজতবাস ও ফাইন বা উভয়ই।	শাস্তিযোগ্য এবং জামিনযোগ্য।
৩০৪-বি	পণের জন্য মৃত্যু- বিয়ের ৭ বছরের মধ্যে অপ্রাকৃতিক কারণে মৃত্যু।	ন্যূনাধিক সাত বছরের জন্য হাজতবাস যা সারা জীবনের জন্যও বাড়তে পারে।	শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।
৩০৬	আত্মহত্যায় প্ররোচনা।	দশ বছরের জন্য হাজতবাস ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।
৩২৬-এ	অ্যাসিড ইত্যাদি ব্যবহারক্রমে ইচ্ছাকৃত আঘাত হানা।	দশ বছরের জন্য হাজতবাস যা সারা জীবনের জন্য বাড়তে পারে ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।
৩২৬- বি	ইচ্ছাকৃত ভাবে অ্যাসিড ছোঁড়া বা ছোঁড়ার প্রচেষ্টা।	পাঁচ বছরের জন্য হাজতবাস তবে সাত বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।
৩৫৪	কোনও মহিলার প্রতি সম্মানহানিকর অপরাধমূলক ব্যবহার বা মহিলাকে নিগ্রহ করা।	এক বছরের জন্য হাজতবাস যা পাঁচ বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য এবং সেই সঙ্গে ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য
৩৫৪-এ	কোনওরকম অবাঞ্ছিত দৈহিক সম্পর্ক বা তার বেশি কিছু মাধ্যমে যৌন নির্যাতন অথবা পর্নোগ্রাফি দেখিয়ে যৌন সংসর্গ চাওয়া বা অনুরোধ করা।	তিন বছর পর্যন্ত হাজতবাস বা ফাইন বা উভয়ই।	শাস্তিযোগ্য এবং জামিনযোগ্য।
	যৌন উত্তেজক মন্তব্যের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন।	এক বছর পর্যন্ত হাজতবাস বা ফাইন বা উভয়ই।	
৩৫৪-বি	মহিলাদের জোর করে পোশাক খুলে ফেলার মতো অপরাধ বা নির্যাতন।	ন্যূনতম তিন বছরের হাজতবাস যা সাত বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য ও ফাইন	
৩৫৪-সি	যৌন দৃশ্য দেখে তৃপ্তিলাভ।	এক বছর পর্যন্ত হাজতবাস যা তিন বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য ও ফাইন-প্রথম অভিযোগের ক্ষেত্রে,দ্বিতীয় বা পরবর্তী অভিযোগের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে তিন বছরের হাজতবাস যা সাত বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য এবং একই সঙ্গে ফাইনের দায়ও বর্তাবে।	শাস্তিযোগ্য এবং জামিনযোগ্য। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অভিযোগের ক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।
৩৫৪-ডি	হানা	প্রথম অভিযোগের ক্ষেত্রে তিন বছরের হাজতবাস ও ফাইন, দ্বিতীয় ও পরবর্তী অভিযোগের জন্য পাঁচ বছর পর্যন্ত হাজতবাস ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং জামিনযোগ্য। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী অভিযোগের ক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।
৩৬৬	বিবাহ ইত্যাদি করার জন্য অপহরণ, পলায়ন বা বাধ্য করা।	দশ বছরের হাজতবাস ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং জামিনযোগ্য।
৩৭৬(১)	ধর্ষণ।	সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড যা সারা জীবনের জন্য সম্প্রসারণযোগ্য ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য
৩৭৬(২)	পুলিশ অফিসার বা সরকারি চাকুরে বা সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য বা ম্যানেজমেন্টে থাকা কোনও ব্যক্তি বা জেলের স্টাফ, সংশোধনাগার বা কাস্টডির অন্য কোনও স্থানে বা মহিলা বা শিশুদের প্রতিষ্ঠান বা ম্যানেজমেন্টে থাকা ব্যক্তি বা হাসপাতালের স্টাফ দ্বারা ধর্ষণ এবং ট্রাস্ট বা কর্তৃপক্ষের অবস্থানে থাকা কোন ব্যক্তি দ্বারা ধর্ষণ, নিকট আত্মীয় দ্বারা ধর্ষিত হলে।	অন্যূন দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড যা সারা জীবনের জন্য সম্প্রসারণযোগ্য, যা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটা পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য

তথ্য সূত্র: ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন

পরিবেশ সুরক্ষায় নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন

বার্তা প্রতিনিধি : একটি গাছ একটি প্রাণ নয়, বরং বলা যায় একটি গাছ দু'টি প্রাণ। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করে তা দিয়ে দু'জন মানুষের সারা বছরের অক্সিজেনের খোরাক মিটতে পারে। তাই জীবনকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গাছের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্য সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি গাছ বছরে আবহাওয়া থেকে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে তা তৈরি করতে গেলে একটি গাড়িকে অন্তত: ২৬ হাজার কিলোমিটার চালাতে হবে। অর্থাৎ গাছ একদিকে যেমন অক্সিজেন দিয়ে মানুষকে সুস্থ রাখার সহায়তা দেয়, তেমনি অন্যদিকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

এরপর ছয়ের পাতায়

দু'য়ের পাতার পর...

'দারিদ্ররেখা'

পরিকল্পনা কমিশন। অধ্যাপক সুরেশ তেন্ডুলকারের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি তাঁদের রিপোর্টে (২০০৯) পূর্ববর্তী সরকারি দারিদ্ররেখার কয়েকটি ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন, গরিবদের যে ভোগ-তালিকার ভিত্তিতে দারিদ্ররেখাটি এতদিন নির্ধারণ করা হয়ে এসেছে সেটি ১৯৭৩-৭৪ সালের। ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেলেও এই তালিকার যথাযথ পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। এছাড়া প্রচলিত দারিদ্ররেখাটি নির্ধারণের সময় এতদিন ধরে নেওয়া হয়েছে গরিব মানুষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র, যদিও ১৯৭৩-৭৪ সালের ভোগ তালিকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত খরচকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত খরচ হচ্ছে ধরে নিয়ে দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করা হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই খরচের পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। এইসব ত্রুটির উল্লেখ করে তেন্ডুলকার কমিটি দারিদ্ররেখা নির্ধারণের নতুন পদ্ধতি প্রস্তাব করে। নতুন পদ্ধতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল দারিদ্রের ক্যালোরি ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি ছেড়ে ভোগব্যয়ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি গ্রহণ। অর্থাৎ, একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের বাইরে আরও কিছু জিনিসও যে একান্ত প্রয়োজন, ভোগব্যয়ভিত্তিক পরিমাপের মাধ্যমে সেই সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে নতুন পদ্ধতিতে দারিদ্রহার পরিমাপ করলে। নতুন এই পদ্ধতিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পিছনে ব্যক্তিগত খরচকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দারিদ্ররেখা পরিমাপের কাজে। এইভাবে হিসেব করলে, ২০০৪-০৫ সালে, দারিদ্ররেখাটি দাঁড়াচ্ছে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু দৈনিক ১৪.৮৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৯.২৯ টাকা। নতুন এই পদ্ধতিতে পরিমিত দারিদ্ররেখাটিকে নবীকরণের সময়ও নয়া একটি পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলে তেন্ডুলকার কমিটি। নয়া পদ্ধতি অনুসারে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ভোগব্যয়ের অঙ্কটিকে শুধু দামসূচকের পরিপ্রেক্ষিতে পালটে নিলেই চলবে না, পালটানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে ইতিমধ্যে গরিব মানুষের ভোগব্যয়ের ধরনে পরিবর্তন কিছু ঘটেছে কিনা। যদি ঘটে থাকে তবে সেই পরিবর্তনকেও দারিদ্ররেখা নবীকরণের সময় যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে, পালটে দিতে হবে দারিদ্ররেখা নির্ধারণের ভোগতালিকাকে। তবে তেন্ডুলকার নির্ধারিত এই দারিদ্ররেখাটি প্রবল বিতর্কের মুখে পড়ায় পরিকল্পনা কমিশন সি রঙ্গরাজনের নেতৃত্বে নতুন একটি কমিটি গঠন করেছে, যে কমিটির রিপোর্ট পেশ করার কথা ২০১৪ সালে।

দারিদ্ররেখা নির্ধারণের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, এই রেখা নির্ধারণের জন্য প্রথমে নেওয়া হয় জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন কতৃক সংগৃহীত পারিবারিক ভোগব্যয়ের তথ্য। যতদিন ক্যালোরি ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি চালু ছিল ততদিন দেখা হত কোন কোন পরিবার নির্ধারিত ক্যালোরি সমান খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে। যারা পারত, সেই সমস্ত পরিবারের গড় আয়কেই দারিদ্ররেখা হিসেবে চিহ্নিত করা হত।

প্রতিবন্ধী সহায়তা

বার্তা প্রতিনিধি: শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তার মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল কানাড়া ব্যাঙ্ক। শিশুদের জন্য স্কুলের পোষাক, ব্যাগ, চাদর, ফল বিতরণ সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য নানা ধরনের সামগ্রী নিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াল কানাড়া ব্যাঙ্ক। এদিনের অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কের ডিভিশন্যাল জেনারেল ম্যানেজার সমাজের দু:স্থ ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলি যে কোন ধরনের দিবস পালনে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তবেই দিবস পালন সার্থক হবে।

রাজ্য প্রথম

বার্তা প্রতিনিধি: প্রজাতন্ত্র দিবসে অংশ নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের 'ছৌ'য়ের ট্যাবলো এবার প্রথম হল। ১৩টি রাজ্যের মধ্যে 'ছৌ'য়ের ট্যাবলোকেই প্রথম হিসেবে বেছে নিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বিশেষ টিম। ট্যাবলোতে পুরুলিয়া 'ছৌ' শিল্পীরা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী প্রদর্শন করেন। 'ছৌ'য়ের পোষাক ও মুখোশে দেব সেনাপতি কার্তিক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

টি পি এস আলু চাষের প্রসার ঘটছে রাজনগরে

যাদব কুমার মন্ডল: বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকে ২০১২ সালের অক্টোবর মাস থেকে চালু হয় সুসংহত জলবিভাজিকা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির শুরুতেই চাষবাসের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হয়। সেই সুবাদেই শুরু হয় প্রকৃত বীজ থেকে আলু চাষ, যা সংক্ষেপে টি পি এস নামে পরিচিত। এই প্রকৃত আলু বীজ দেখতে টমেটো, বেগুনের বীজের মত। প্রথম প্রথম চাষীরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলুর চারা তৈরি করে মূল জমিতে লাগানো, সেটা আবার কি? স্থানীয় চাষীরা শুনেই বিস্মিত হয়েছিলেন। লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীদের কাছ থেকে সব কিছু শুনে পাতাডাঙ্গার সন্তোষ মন্ডল, মাধাইপুরের প্রদীপ রায় এবং ফরিদপুরের জয়ন্ত চক্রবর্তী তাদের অল্প জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রকৃত বীজ থেকে (টি পি এস) পদ্ধতিতে আলু চাষ করেন। এইভাবে আলু চাষে বিঘা প্রতি বীজ লাগে ১৫ থেকে ১৬ গ্রাম, যার বাজার মূল্য ৩০০ টাকা। অন্যদিকে সাধারণ পদ্ধতিতে আলু চাষ করলে প্রায় দু'কুইন্টাল আলু লাগবে যার বাজার মূল্য ২০ টাকা কেজি ধরলে ৪০০০ টাকা। যেহেতু এধরনের চাষ তাদের কাছে নতুন তাই তারা কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই টি পি এস থেকে আলু চাষ শুরু করেন। চাষ করার পর দেখা যায়, সন্তোষ মন্ডল ৭ কুইন্টাল, প্রদীপ রায় ১১ কুইন্টাল, জয়ন্ত চক্রবর্তী ৫ কুইন্টাল আলু পেয়েছেন। এই আলুগুলি পরবর্তী বছরে লাগানোর জন্য বীজ হিসাবে হিমঘরে রাখা হয়। বর্তমান বছরে আলুর দামের উর্ধ্বগতি দেখেও চাষীরা একটি আলুও বিক্রি করেননি। কারণ টি পি এস থেকে যে আলু উৎপাদন হয়েছে সেটিই হল আসল ফাস্ট কার্ট। বাজারে বিক্রি না করলেও লোক কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে সুসংহত জলবিভাজিকা কর্মসূচির অধীনে পার্থসারথী পাল, রঞ্জু হোসেন, নাসিমা বিবি, অভিরাম মন্ডল, প্রহ্লাদ ঘোষ প্রমুখ চাষীদের কিছু বীচন আলু দেওয়া হয়। উক্ত বীচন আলু লাগানোর পর দেখা গিয়েছে বাজার থেকে কেনা আলুর বীজের চাইতে এই বীজের রোগপোকা সহনশীলতা যথেষ্ট বেশি। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে একটি আলু গাছ থেকে এক থেকে দেড় কেজি আলু পাওয়া যাচ্ছে। আলুর রঙ খুব সুন্দর। ধীরে ধীরে টি পি এস আলু চাষের প্রসার ঘটেছে। ঘটবে নাই বা কেন? এতে আলু উৎপাদন বেশি হয়, বীজ কম লাগে। চাষীদের আর্থিক লাভও বেশি হয়।

পাঁচের পাতার পর...

পরিবেশ সুরক্ষায় গাছ কাটা বন্ধ

পরিবেশ সুরক্ষাকারী এই গাছকে কিন্তু আমরা নির্বিচারে কেটে চলেছি। সরকারি, বেসরকারি সব পর্যায়েই এই বৃক্ষ নিধন চলেছে অবাধে। নগরায়ণের প্রথম কোপটাই পড়েছে গাছের উপর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আইন থাকা সত্ত্বেও কেটে ফেলা গাছের পরিবর্তে অন্য গাছ লাগানো হচ্ছে না। নির্বিচারে গাছ কাটার পরিণামে বায়ুদূষণের নিরিখে ফুসফুস সংক্রান্ত নানা রোগের আতুঁড় ঘর হয়ে উঠেছে কোলকাতা মহানগরী। তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসার রোগীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর পরেও কি আমরা নির্বিচারে গাছ কাটায় দাড়ি টানবো না?

আশার কথা, সম্প্রতি হাইকোর্টের একটি উদ্যোগের ফলে গাছ নিধনের ক্ষেত্রে লাগাম টানা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। হাইকোর্ট একটি কমিটি গঠন করেছে, যার অনুমতি ছাড়া শহরে কোন গাছ কাটা যাবে না।

এটা ঠিক যে, রাজ্যে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সবুজের সমারোহ ঘটাতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। একটি সহজ উদাহরণ সকলের চোখের সামনেই তুলে ধরা যেতে পারে। সরকার গাছ কেটে রাস্তার পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে গাছগুলি কেটে ফেলে। তারপর রাস্তা বাড়লে বাড়তি রাস্তার অধিকাংশই চলে যায় গাড়ীর গ্যারেজের দখলে, বালি, স্টোন- চিপস ও ইট প্রভৃতি ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের দখলে, অলিখিত ম্যাটাডোর স্ট্যান্ড এবং রিক্সা ভ্যান স্ট্যান্ডের দখলে। বাকী কিছুটা অংশ মাছ ও সবজি ব্যবসায়ীদের দখলে। তাহলে কি দাড়াঁল? গাছ কাটা হল, রাস্তা বাড়ল, আর অন্যরা তার দখল নিল। ভোটের দায় দেশের ও দশের চেয়ে অনেক বড় বলেই কোন রাজনৈতিক দলই এদের অবৈধ দখল উচ্ছেদের পথে হাঁটতে সাহস দেখান না। এ ক্ষেত্রে বাম ডান উভয়কেই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিগত ৩৭ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এই নমুনার বদল ঘটতে দেখা যায় নি।

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও হে নগর'। মানব সভ্যতার উন্নয়নের বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমরা পুরোপুরি এই শ্লোগানকে আঁকড়ে থাকতে পারবোনা, একথা যেমন ঠিক তেমনি উন্নয়নের নামে অহেতুক সবুজ ধ্বংস করে, লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ারও কোন অর্থ হয় না। তাহলে উন্নয়নের সুফল ভোগ করার জন্য কারা থাকবেন? উন্নয়ন ও পরিবেশকে পাশাপাশি রেখে সবুজ বাঁচানোর উদ্যোগ সার্থক করে তুলতে পারলে মানুষ বাঁচবে এবং পরিবেশের সুরক্ষাও বজায় থাকবে।

প্রথম পাতার পর...

জীবন জীবিকার মেল বন্ধন

কৃষির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে বলেন, প্রকৃতিগত পরিবর্তন, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, মাটির নীচে সঞ্চিত জলভান্ডার থেকে ব্যাপকভাবে জল তুলে নেওয়া প্রভৃতি চাষবাসের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তার মতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পরিবেশ পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য মানুষও সমানভাবে দায়ী। তিনি জল ও মাটি সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ফলের গাছ সহ বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানোর উপর জোর দেন। লোক কল্যাণ পরিষদের সক্রিয় সহায়তায় রাজনগর ব্লকের অধীন যে সমস্ত মৌজায় জলবিভাজিকা কর্মসূচির কাজ রূপায়িত হচ্ছে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তিনি চাষীবন্ধু, স্বনির্ভর দল সহ অন্যান্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

কৃষি আধিকারিকগণ মেলায় কৃষি বিষয়ক আলোচনাপর্বে চাষবাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। যেমন রবি মরশুমে সর্ষে গাছের জাবপোকা আক্রমণের প্রথম দিকে যে সমস্ত গাছের ডগায় জাবপোকা দেখা যাবে কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে সেই ক'টা ডাল কেটে নষ্ট করে দেওয়া। গমের ক্ষেতে যদি সরষে গাছ লাইন করে লাগানো হয় তাহলে আগাছা কম হবে। ফসলের রোগ শোষক পোকা থেকে বাঁচার জন্য পাতার নীচের দিকে অবশ্যই স্প্রে করা উচিত বলে তারা জানান। আধিকারিকরা এদিন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন। যেমন, কোথায় আবেদন পত্র পাওয়া যাবে বা কত টাকা পর্যন্ত লোনে গ্যারান্টি লাগবে না এধরনের প্রশ্নের উত্তরে আধিকারিকরা জানান, ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আবেদনপত্র পাওয়া যাবে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণে কোন সিকিউরিটি বা গ্যারান্টি লাগবে না। বছরে তিনটি মরশুমে - (খারিফ, রবি ও প্রাক খারিফ) কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয় বলে তিনি জানান।

মেলার দ্বিতীয় দিনে প্রাণীপালন ও মৎস্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য বিভাগের আধিকারিকগণ। যেমন শীতকালে হাঁস মুরগীর গলা ফোলা, ঝিমুনি প্রভৃতি রোগের কিভাবে প্রতিকার করা যাবে, বিভিন্ন সময়ে পশুপাখীদের কি কি টিকাকরণ করতে হবে- প্রভৃতি নানা প্রশ্ন এদিন তুলে ধরেন প্রাণী পালনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। আধিকারিকরা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন

ধরনের প্রাণী রোগ নিয়ে আলোচনা করেন। বেশি মাংস ও ডিম উৎপাদন করে প্রাণীপালন ব্যবসা যাতে লাভজনক হতে পারে তার জন্য খাঁকি ক্যাম্বেল, আর আই আর প্রভৃতি উন্নত জাতের হাঁস মুরগী পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রাণীপালন দপ্তরকে গ্রামে পশু টিকাকরণ শিবির নিয়মিত করার জন্য দাবী জানান। ব্লক প্রাণী সম্পদ আধিকারিক এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা মৎস্য চাষ বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা যেমন, মাছের কোন ধরনের খাবার প্রয়োজন, কোন ধরনের মাছ চাষ বেশি লাভজনক, রোলিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি সমন্বয় ভিত্তিতে হাঁস পালনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হওয়া যায়। তাই কথায় বলে-'হাঁস মাছ যদি থাকে পুকুরে, পেট ভরে খাবো ভাত দুপুরে'।

মেলার তৃতীয় দিনে আখ চাষ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন কৃষি আধিকারিক প্রিতেষ কুমার দাস। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লোক কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে সত্য নারায়ণ সর্দার রাজনগর ব্লকের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭টি মৌজায় এবং ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ টি মৌজায় সুসংহত জল বিভাজিকা কর্মসূচির রূপায়ণের বিস্তৃত বিবরণ দেন। চাষীদের মধ্যে উপভোক্তা গোষ্ঠী গঠন, স্বনির্ভর দলের প্রশিক্ষণ, উন্নত জাতের হাঁস মুরগী বিতরণ, এস আর আই পদ্ধতিতে ধান ও এস ডাব্লু আই পদ্ধতিতে গম চাষের প্রশিক্ষণ, লেটুস, সবুজ ফুল কফি সহ নতুন নতুন সবজি উৎপাদনের প্রতি চাষীদের আগ্রহ তৈরি করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

মেলায় প্রাণী সম্পদ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, প্রভৃতি সরকারি দপ্তরের স্টলের পাশাপাশি লোক কল্যাণ পরিষদ, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট' আসানসোল বর্ধমান সেবা কেন্দ্র প্রভৃতি স্টলগুলিতে স্বেচ্ছাসেবীদের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করা হয়।

১৫৪ জন আদিবাসী ছাত্রীকে সাইকেল প্রদান, 'নিজভূমি নিজগৃহ' কর্মসূচির অধীনে ৫০ জনের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া, দলের সদস্যদের মধ্যে হাঁস মুরগী বিতরণ ছিল এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এই মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। রান্না প্রতিযোগিতায় মালপোয়া, পিঠেপুলি, ভুজিয়া, মিক্স পকোড়ার মধ্যে জমজমাট লড়াই চলে। চাষবাস, রান্না প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। নাচ, গান, বাউল গান প্রভৃতি নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেলা প্রাঙ্গন ছিল মুখরিত। এই মেলাকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। গ্রামীণ জীবন-জীবিকার মেল বন্ধনে সফল রাজনগর কৃষিমেলা।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত